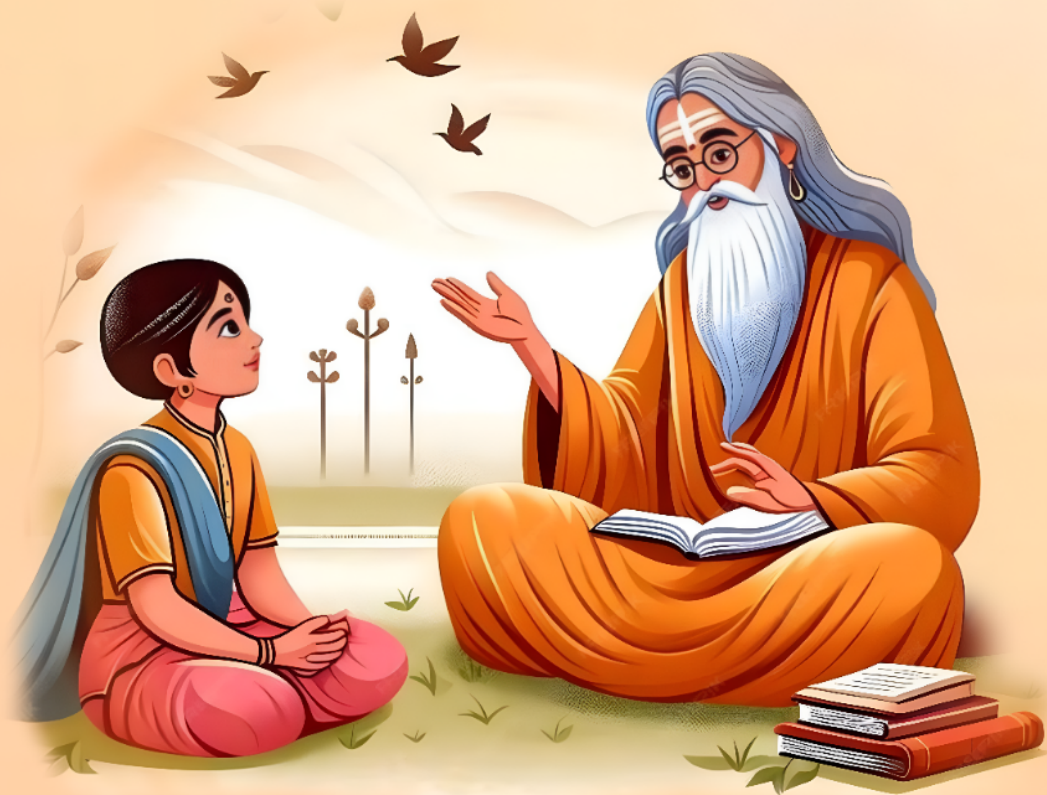


গুরুগিরি



প্রণেতা
পণ্ডিত দীনবন্ধু বেদশাস্ত্রী
সম্পাদনা
শ্রী রজিৎ চন্দ্র

ওতম্

গুরুগিরি

[বর্তমান গুরুবাদ ও প্রকৃত গুরুর অন্বেষণমূলক রচনা]

প্রণীত

পণ্ডিত দীনবন্ধু বেদশাস্ত্রী

বেদোপদেশক, বঙ্গ-আসাম আৰ্য প্রতিনিধি সভা

কলকাতা

পুনর্লিখন ও সম্পাদনা

রজিৎ চন্দ্র



বেদ-গীতা শাস্ত্র অন্বেষণ

[সর্বদা সত্য ও ধর্মের পথে]

গুরুগিরি

(বর্তমান গুরুবাদ ও প্রকৃত গুরুর অন্বেষণমূলক রচনা)



প্রচ্ছদ ও অঙ্করবিন্যাস
বেদ গীতা শাস্ত্র অন্বেষণ

প্রকাশকাল
২০২৫ ইং

Contact us —
vedicgita88@gmail.com



॥ সর্বজ্ঞানময়ো হি সঃ ॥

"গুরুগিরি" পুস্তকের এই সংস্করণটি "বেদ-গীতা শাস্ত্র অন্বেষণ" কর্তৃক সর্বস্বত সংরক্ষিত

ओ३म्

ओ३म् भूर्भुवः स्वः । तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ।
धियो यो नः प्रचोदयात् ॥

ও৩ম ভূৰ্ভুৱ স্বঃ । তৎ সৱিতুৰ্বৰেণ্যং ভৰ্গো দেৱস্য ধীমহি ।
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥

(ঋগ্বেদ ৩।৬২।২০, যজুৰ্বেদ ৩।৩৫, সামবেদ ১৪৬২)

"পরমাত্মা প্রাণস্বরূপ, দুঃখনাশক ও সুখস্বরূপ। যে জগৎ প্রসবিতা দেবাদিদেব আমাদের কর্ম বা বুদ্ধির প্রেরণা দান করেন, আমরা সেই পরমাত্মার অবিদ্যা নাশক পরব্রহ্মের জ্যোতি ধ্যান করি।"

এটাই বেদের গায়ত্রী মন্ত্র। এই একই মন্ত্রে পরমাত্মার স্বরূপ, তাঁর সহিত আমাদের সম্বন্ধ ও তাঁর উপাসনার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করা হয়েছে। এই মন্ত্রের হৃদের নাম গায়ত্রী বলে মন্ত্রের নামও গায়ত্রী হয়েছে। পরমাত্মার উপাসনার জন্য গায়ত্রীই সিদ্ধ বৈদিক মন্ত্র। এ জন্য গায়ত্রীর নাম 'গুরুমন্ত্র' এবং 'বেদমাতা'। সৃষ্টির আদিতে পরমাত্মা সমগ্র মানব জাতির জন্য এই মন্ত্র শুদ্ধাত্মা ঋষিদের হৃদয়ে প্রদান করেছিলেন, তাই পরমাত্মা আমাদের সকলের গুরু। মহর্ষি পতঞ্জলি যোগ সূত্রে বলেছেন- "স এষ পূৰ্বেধামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ ॥" (যোগদর্শন ১। ২৬) সেই পরমাত্মা আমাদের পূর্বজ আচার্যদিগের গুরু, কাল তাঁকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে না; তিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ - তিন কালেই অবস্থান করেন। পরমাত্মাই মুখ্য গুরু এবং যিনি পরমাত্মার বিষয়ে জ্ঞান দান করেন, তিনি গৌণ গুরু। এই গৌণ গুরু সম্বন্ধেই বর্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করা হবে।

গুরুর লক্ষণ

চিকিৎসা শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ হাভুড়ে বৈদ্যের হাতে পড়লে যেমন রোগীর অকালমৃত্যু ঘটে, নৌকা চালনায় অদক্ষ মূর্খ কর্ণধারের হাতে পড়লে যেমন নৌকা বিপথগামী হয়, অথলোভী, ব্যবসায়ী, মূর্খ গুরুর হাতে পড়লে শিষ্যও তেমনি ধনে-প্রাণে সর্বস্বান্ত হয়। তন্ত্র-শাস্ত্রকার এইজন্যই বলেছেন- "হে দেবি! শিষ্যের ধন অপহরণের জন্য অনেক গুরুই আছে, কিন্তু শিষ্যের সন্তাপ অপহরণের জন্য গুরু পাওয়া দুষ্কর^১ গুরুর কবল হতে নিষ্কৃতি পাওয়া আজকাল একরূপ অসম্ভব হয়েছে। বহু ব্রাহ্মণ বেদবিদ্যা ভুলে ডাক্তার, কবিরাজ, উকিল, মোক্তার বা কেরাণী সেজেছেন এবং যাঁদের ভাগ্যে তা ঘটে নাই, তাঁরা

১। 'বহবো গুরবঃ সন্তি শিষ্যা বিভাপহারকাঃ দুর্লভঃ সদগুরুঃ দেবি শিষ্য সন্তাপহারবঃ।

গুরুগিরি

তিনিটির যে কোনও একটি ফুৎকার-বৃত্তি গ্রহণ করেছেন। উনোনে ফুঁ বা পাচকগিরি, শাঙ্খে ফুঁ বা পুজারীগিরি এবং কানে ফুঁ বা গুরুগিরি। এই কান ফুঁকা গুরুদের হস্ত হতে নিকৃতি পাবার জন্যই শাস্ত্রকারগণ গুরুর লক্ষণ বর্ণনা করেছেন। বেদ প্রথমেই বলিলেন- "গুরুকে ব্রহ্মচার্য্য অবলম্বন করতে হবে, তারপর ব্রহ্মচারী বা শিষ্যলাভের ইচ্ছা করবে" ^১।" শুধু তাহাই নয়। গুরুর এই সব গুণ আছে কিনা পরীক্ষা করতে হবে।

"তাকে শুদ্ধতাপূর্বক বিদ্যাভ্যাসী এবং শিল্প কলা, কৌশল, চিত্র লেখনাদি ও হস্তক্রিয়াদিতে কুশল হতে হবে, তাঁকে কর্মদক্ষ, চতুর অথচ সরল স্বভাব ও শুদ্ধ হতে হবে; তাঁর হস্তাদি বৃথা কর্ম হতে বিরত থাকবে; পাঠ্য পুস্তক ও মন্ত্রাদি বিষয়ে তাঁকে নিপুণ হতে হবে। ইন্দ্রিয়াদি তাঁর সবল থাকবে। কোনরূপে যেন তিনি অঙ্গহীন বা রোগগ্রস্ত না হন। তাঁকে পদার্থ বিদ্যায় পারদর্শী হতে হবে। তিনি কাউকেই নিন্দা করবেন না। তিনি ক্রোধ-হীন, কষ্টসহিষ্ণু, শিষ্যবৎসল ও শাস্ত্রজ্ঞ হবেন। শিষ্যকে জ্ঞাতব্য বিষয় সহজেই বুঝিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা থাকা চাই। যেমন উপযুক্ত সময় মেঘবর্ষণ করলে শস্য উৎপন্ন হয় এবং সকলে আনন্দিত হয়, তদ্রূপ শিষ্যের হৃদয়ক্ষেত্রে বিদ্যারূপ মেঘ বর্ষণ করিয়ে তাকে সর্বগুণ সম্পন্ন করতে পারলে তবে সকলে আনন্দিত হবে" ^২।" গুরুর এই সব গুণ থাকা চাই। "গুরুকে সমগুণাবলম্বী ইন্দ্রিয়জয়ী, আচার-বিনয়-বিদ্যাদি গুণযুক্ত, বিনীত শুদ্ধ বেশধারী, শুদ্ধাচার সুপ্রতিষ্ঠা, পবিত্র, দক্ষ সুবুদ্ধিমান, কুশলবুদ্ধিযুক্ত, সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী, নিত্য-নৈমিত্তিক কার্যাদিতে সুপটু, শুদ্ধ, দয়ালু, সচ্চরিত্র, স্বদ্বংশজাত, বিদ্বান পরিত্রীতে অনাসক্ত ও দৃঢ়সংকল্প হতে হবে" ^৩।"

কোন গুরু বর্জনীয়

চাণক্য পণ্ডিত এক কথায় বলেছেন "দয়াহীন ধর্ম ও বিদ্যাহীন গুরুকে ত্যাগ করবে।" শুধু তাই নয়, শাস্ত্রকার বলেছেন "যিনি হীনাস্ত্র, কপট রোগী, বহু আশা সম্পন্ন বহুভাষী প্রভৃতি দোষ হতে মুক্ত, তিনিই শিষ্যের পক্ষে যথার্থ গুরু।"

১। "আচার্য্যো ব্রহ্মচর্যেণ ব্রহ্মচারিণমিচ্ছতে"। (অথর্ববেদ ১১।৫।১৭)

২। "আচার্য্যং পরীক্ষতে - তদ্যথা পর্যবদাত শ্রুতঃ পরিদৃষ্ট কর্মণঃ দক্ষ দক্ষিণঃ শুচিঃ মিতহস্তমুপকর্ণবন্ত সবেন্দ্রিয়োপপন্নঃ প্রকৃতিজ্ঞঃ প্রতি প্রতিজ্ঞ মনুপস্কৃতবিদ্যমন সূচকমকোপঃ ক্রেশক্ষমঃ শিষ্যবৎসলমধ্যাপকঃ জ্ঞাপনসমর্থ মিত্যেষঃ গুণোহ্যচাৰ্য্যঃ স্বক্লেদ্রমার্তবো মেঘ ইব শস্য গুণৈঃ সুশিষ্যমাসু সম্পাদয়তি"

৩। "শাস্তোদান্তঃ কুলীনশ্চ বিনীতঃ শুদ্ধবেশবান। শুদ্ধাচারঃ সুপ্রতিষ্ঠঃ শুচিদক্ষঃ সুবুদ্ধিমান॥ সদাচার কুশলধীঃ সর্বশাস্ত্রার্থ পারগঃ। নিত্যনৈমিত্তিকানাঞ্চ কার্যানাং কারকঃ সুচিঃ॥ দয়াবান শীলসম্পন্নঃ। সংকুলীনো মহামতিঃ। পরদারেষু বিমুখো দৃঢ় সঙ্কল্পকো দ্বিজ॥"

গুরুগিরি

জলরক্তবিকার ও মাৎস্য্য দোষে দুষ্ট গুরুকে চিরতরে ত্যাগ করবে^১। "যাঁরা গ্রীষ্মাবকাশে আম কাঁঠালের সময় প্রতি বৎসর শিষ্যের পরকালের বার্ষিক রাজস্ব আদায় করতে আসেন, দরিদ্র, অন্ন-বস্ত্রহীন শিষ্যকে অভিশাপের ভয় দেখিয়ে অর্থ আদায় করেন, যাঁরা গৃহে বা অন্যান্য স্থানে কদাচারী বা কদাহারী হলেও শিষ্যগৃহে স্বপাক ভোজন করেন ও শিষ্যকে উচ্ছিষ্ট প্রদান করেন, যাঁরা পদধূলি ও চরণামৃত দানে শিষ্যের পারমার্থিক মুক্তির ব্যবস্থা করেন এবং যাঁরা ভট্টচরিত্র, মুখ, দান্তিক, ছুৎমার্গাবলম্বী ও জাতিভেদ দোষে দুষ্ট-গুরুর লক্ষণ বিচার করে তাঁদেরকে যত শীঘ্র বিদায় করা হবে গৃহস্থের পক্ষে ততই মঙ্গল।

শূদ্রের বেদাধিকার নাই

প্রাচীনকালে আচার্য্য শিষ্যকে গায়ত্রী মন্ত্রের সঙ্গে যজ্ঞোপবীত প্রদান করতেন এবং শিষ্য বেদপাঠে অধিকারী হয়ে আচার্য্যের নিকট হতে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করতেন। তখন গুরু বলতে আচার্য্য বা শিক্ষক বুঝাত এবং গুরুমন্ত্র বলতে গায়ত্রী মন্ত্র বুঝাত। তখন সমগ্র আর্থজাতি একই জাতীয় মন্ত্র গায়ত্রীতে দীক্ষিত হয়ে অখন্ড বিশ্বের উপর তার জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা-সভ্যতাকে প্রচার করতে পেরে ছিল। ভারতের কোন এক বর্বর যুগে ভারতের বৈশিষ্ট্য ধ্বংস হয়ে গেল, তখন জীবিত জাগ্রত আর্থ ভূমিতে মৃত আর্থত্বের প্রেতলীলা অবাধে চলতে থাকল। যে স্ত্রী ও শূদ্র ছিল বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি, তাঁদেরকেই বেদ উপনিষদ পাঠে অনধিকারী ঘোষণা করা হলো। যে গায়ত্রীতে ছিল সমগ্র মানব জাতির অধিকার, তা ব্রাহ্মণের করতলগত হলো। অতি সহনশীল, অল্পে তুষ্ট ও মুখ শূদ্রের জন্য তখন বেদের পরিবর্তে নানারূপ পুরাণ ও উপপুরাণের সৃষ্টি হলো। শাক্ত, বৈষ্ণব ও সৌর আদি অসংখ্য সাম্প্রদায়িক ধর্মের বীজ হিন্দুসমাজে রোপিত হলো। শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায় সকল পুরাণই তখন নিজেকে "নিগম কল্পতরোগলিত ফলম্" বেদ কল্পতরুর সুপক্ক ফল বলে আত্মপরিচয় দিতে লাগলো। স্ত্রী ও শূদ্রের প্রতি করুণাবিষ্ট হয়ে জগতের সন্মুখে "স্ত্রী শূদ্র দ্বিজ বন্ধুনাং ত্রযী ন শ্রুতিগোচরা" স্ত্রী, শূদ্র ও দ্বিজ বন্ধুগণের বেদে অধিকার নাই ঘোষণা করতেই এই পুরাণ রচিত হলো। বেদকে ছেড়ে তখন হতে শূদ্রগণ পুরাণের সাম্প্রদায়িক জালে আবদ্ধ হলো। শুধু তাই নয়, শূদ্রকে গায়ত্রী মন্ত্র হতে চিরতরে বঞ্চিত তন্ত্রশাস্ত্রের দোহাই দিয়ে ত্রীং, ক্লীং, দ্রুম, দ্রাম, ফুট, ফট স্বহা আদি অর্থহীন উৎকট শব্দ যোগে কামগায়ত্রী, লোম-মোহ-গায়ত্রী আদি নানারূপ মন্ত্রের সৃষ্টি করা হলো। যাঁহরা এই সব মন্ত্র প্রচারের ভার নিলেন। তাঁরাই পরবর্তী যুগে গুরু নামে অভিহিত হলেন। বল্লভাচারী, নারায়ণস্বামী, কর্তা-ভজা, আউল, বাউল, সাঁই বা গোস্বামীরূপে তাঁরাই গুরু সেজে নানা রূপ কপোল কল্পিত মন্ত্র

১। "হীনাঙ্গ কপট রোগী বহ্নাশী বহুজল্লকঃ। এতৈর্দোষৈবিমুক্তো যঃ স গুরুঃ শিষ্য সম্মতঃ॥
জলরক্ত বিকারঞ্চ বর্জয়েন্নতিমান সদা। সদামৎসর সংযুক্তং গুরু তদ্রূপ বর্জয়েৎ।"

গুরুগিরি

প্রচার করে শূদ্রের চক্ষুতে ধূলি নিক্ষেপ করলেন। অন্যের অনিষ্ট করতে গেলে নিজেরও অনিষ্ট হয়। শূদ্রকে বেদমন্ত্র হতে বঞ্চিত করতে গিয়ে যে মন্ত্রজাল রচনা করা হলো, ব্রাহ্মণও স্বয়ং সেই জালে আবদ্ধ হলেন। ব্রাহ্মণও নানারূপ গুরুমন্ত্রে দীক্ষিত হতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ নিজের বৈশিষ্ট্য এ পর্যন্তও ত্যাগ করেন নাই গায়ত্রী মন্ত্রে তাঁকে দীক্ষিত হতে হবে, যজ্ঞোপবীত তাঁকে গ্রহণ করতেই হবে। গায়ত্রীমন্ত্র না নিয়ে ভারতের একজন ব্রাহ্মণও অন্য মন্ত্রে দীক্ষিত হন না। অন্যদিকে শূদ্রগণ গায়ত্রী মন্ত্রে অদীক্ষিত হয়ে বৈষ্ণবমন্ত্র বা শাক্তমন্ত্র বা তান্ত্রিকমন্ত্র পেয়ে আত্মদে আত্মহারা হতে লাগল।

গুরুগণ এই সুযোগে একে একে শত সহস্র শিষ্য গ্রহণ করতে লাগলেন। গুরুগণ প্রভুবংশ এবং শিষ্যগণ দাসবংশে পরিণত হলেন। গুরুগণ বংশ পরম্পরায় শিষ্যবংশের ইহকাল ও পরকালের উপর সাম্রাজ্য বিস্তার করে, ভগবানের রাজস্ব আদায় করতে থাকলেন। রাশিয়ার সশস্ত্র জারের সাম্রাজ্যবাদ অপেক্ষাও এই সব নিরস্ত্র গুরুদের সাম্রাজ্যবাদ ভয়াবহ ও অতি বিকট। আজ যুক্তি, শাস্ত্র ও ধর্মের আদেশে এই সব বর্জন করতেই হবে।

সাম্রাজ্যবাদী গুরুর শিক্ষা

গুরুর সাম্রাজ্যবাদ ভগবানকেও গ্রাস করেছে। গুরুদের নিকট শিষ্যেরা প্রথমেই শিক্ষা পায় "গুরু রেখে গোবিন্দ ভজে, সে পাপী নরকে মজে" অর্থাৎ গুরু ভগবান হতেও শ্রেষ্ঠ। গুরুকে উপাসনা করলেই ভগবানের উপাসনা হয় এবং গুরুকে উপাসনা না করে ভগবানের উপাসনা করলেই সে মহাপাপী নরক ভোগ করবে। পৌরাণিক যুগেও শূদ্রের ব্রাহ্মণাতন্ত্র জাগানোর জন্য প্রচার করা হয়েছিল "ভগবানের এক নাম বিপ্রদাস বা বামুনের চাকর। বামুনের এক পূর্বপুরুষ ভৃগু ঋষি, নারায়ণের রাজপ্রাসাদ বৈকুণ্ঠে ঢুকে নারায়ণের বুকে পদাঘাত করে ছিলেন এখন পর্যন্তও নারায়ণ সে পদচিহ্ন সাদরে বক্ষে ধারণ করে ধন্য হয়েছেন।" গুরুর দ্বিতীয় উপদেশ "গুরু লোভী হলে তিনি বামন অবতার, দ্রোণী হলে তিনি নৃসিংহ অবতার এবং কামুক হলে তিনি স্বয়ং কৃষ্ণাবতার।" দেশে এইরূপ বামন, নৃসিংহ বা কৃষ্ণ গুরুর অভাব নাই। গুরু বামনরূপে বলিরাজার মতো কত শিষ্যের যে সর্বস্ব লুণ্ঠন করেছেন তার হিসেব নাই। তাঁরা স্পষ্টই বলে থাকেন "শিষ্যের যা কিছু সবই গুরুর অধিকারে, গুরুর অনুমতি ব্যতীত শিষ্য তার সম্পত্তি ভোগ করতে পারবে না।" এইভাবেই বঙ্গের নানা জেলায় "গুরু প্রসাদী" প্রথার প্রবর্তন হয়েছিল। মেদিনীপুর জেলায় যুবকদের লাঠির জোরে এ প্রথা মেদিনীপুর হতে অন্তর্হিত হয়েছে। এখনও বঙ্গের নানা স্থানে এ প্রথা গুপ্তভাবে উকিঝুঁকি দিতেছে। শিষ্যের বাড়িতে তরকারি হলে, পুকুরে মাছ হলে, গরুর দুধ হলে, প্রথমে গুরুকে দিতে হবে। তিনি প্রসাদ করে দিলে, তবে শিষ্য তা ভোগ করতে পারবে। শ্রদ্ধা এতদূর গড়িয়ে ছিল যে, বিবাহের পরও গুরুর অনুমতি ব্যতিরেকে, স্ত্রী গ্রহণের অধিকার থাকত না। অনেক সময় বীভৎস কাণ্ড ঘটেছে তাও

গুরুগিরি

শুনতে পাওয়া যায়। কুরুক্ষেত্র তীর্থে এখনও এ নিয়ম আছে, কুরুক্ষেত্রে মৃতক শ্রাদ্ধ করে স্বামী ও স্ত্রী তীর্থগুরু পাভাকে সর্বাঙ্গ দান করে। অনেক ধর্মভীরু তার স্ত্রীকে পর্যন্ত পাভাকে দান করে এবং স্ত্রীর মূল্যস্বরূপ স্বামীর নিকট হতে কিছু গ্রহণ করে পাভা স্ত্রীকে স্বামীর নিকট প্রত্যর্পণ করে। বঙ্গদেশেও গুরুবেশে শত সহস্র ব্রাহ্মণ অবতার তাদের শিষ্য বলিরাজার সর্বস্ব লুণ্ঠন করে পাতালে পাঠাতে চায়। নৃসিংহ অবতারেরও অভাব নাই। বিবাহ, শ্রাদ্ধ, বার্ষিক প্রণামী বা রাজস্ব আদায় উপলক্ষে, অনেক সময় গুরুগণ ত্রৈলোকে অগ্নিশর্মা হয়ে, পশুরাজ সিংহের ন্যায় এরূপ অভিশাপ বর্ষণ করতে থাকেন, হিরণ্যকশিপুর ন্যায়, শিষ্যের নাড়ীভুড়ি খাবার জন্য এমন বিক্রম প্রকাশ করেন যে তাঁদেরকে নৃসিংহ অবতার না বলে পার পাওয়া যায় না।

ঘৃণা লজ্জা ভয়

কৃষ্ণাবতারই বা কম কিসের? এইসব গুরুগণের ননী মাখন চুরি করে খেতে হয় না। শিষ্যেরা আদর যত্নসহকারেই তা গুরুসেবায় লাগিয়ে দেয়। তবে অনেক সময় এদের কেউ কেউ শিষ্যরূপ গোপীগণের মন-প্রাণ হরণ করবার জন্যও চেষ্টা করেন। শিষ্যের গলার হার চুরি করে অনেক গুরুই কারাবাস বরণ করেছেন এবং গোপীগণের বস্ত্রহরণ, রাসলীলা ও কুঞ্জবিলাস করে অনেক গুরু গ্রহর খেয়েছেন এরূপ দৃষ্টান্ত বহু পাওয়া গিয়েছে। গুরুর তৃতীয় শিক্ষা – "ঘৃণা-লজ্জা-ভয় তিন থাকতে নয়।" অর্থাৎ শিষ্যরা এই তিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলে তবে কৃষ্ণ-পদ লাভ করতে পারবে। শিষ্য ঘৃণা জয় করেছে কিনা পরীক্ষার জন্য তাঁরা অনেক সময় শিষ্যকে খুঁতু ও উচ্ছিষ্ট আশ্বাদন করতে দেন। লজ্জা জয় হলো কিনা পরীক্ষার জন্য তাঁরা শিষ্যদের বস্ত্র হরণাদি করেন। ভয় জয় হলো কিনা পরীক্ষার জন্য তাঁরা অমাবস্যার কালো রাতে শিষ্যকে শ্মশান ঘাট হতে নরকঙ্কাল আনতে আদেশ করেন। বহু শিষ্য ও শিষ্যা এই সব পরীক্ষা সাগর উত্তীর্ণ হয়েও গুরুর কৃপা লাভ করেছেন এরূপ দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই। অন্য একদল গুরু, নিজেদের গোপী বলে পরিচয় দেন এবং শিষ্য ও শিষ্যাগণকেও গোপীভাবে অনুপ্রাণিত হতে উপদেশ দেন। ইহাদের উপাসনার নাম "সখি ভজন"। ভগবান ইহাদিগকে পুরুষ করে সৃষ্টি করলেও এরা তা অস্বীকার করে, দাঁড়ি, গোঁফ কামিয়ে এবং স্ত্রীবেশে সর্বালঙ্কার ভূষিতার ন্যায় এবং অর্থ অবগুণ্ঠনাবৃত হয়ে বসে থাকেন। শিষ্য ও শিষ্যাগণ সখিভাবে ইহাদের সহিত স্বচ্ছন্দভাবে মেলামেশা করতে পারেন। এই সখি সম্প্রদায় অযোধ্যা ও উত্তর বিহারেই অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। বঙ্গদেশেও ইহাদের দল বীরে ধীরে পুষ্ট হচ্ছে।

নকল গুরু পরীক্ষার উপায়

অধিকাংশ হিন্দুর বাড়িতেই অন্তত পক্ষে বৎসরান্তে একবার করে গুরুচাঁকুর আসেন। তিনি জালগুরু

গুরুগিরি

কিনা পরীক্ষার জন্য কয়েকটি উপায় আছে। প্রথম উপায় তাঁকে শিষ্যের রক্ষিত অন্ন ভোজন করার জন্য অনুরোধ করতে হবে। গুরু শিষ্যকে মন্ত্রদান করেই বলেন "তুমি আজ হতে আমার সন্তান! আমার দ্বারা তোমার দ্বিতীয় জন্ম লাভ হলো।" গুরু যদি শিষ্য বা সন্তানের রক্ষিত অন্ন ভোজন করতে আপত্তি করেন তবে তাঁকে জালিয়াৎ গুরু বলে মনে করতে হবে। গুরু যার রক্ষিত অন্ন গ্রহণ করতে পারেন না তিনি তাঁকে মন্ত্র দিয়ে হৃদয়ে গ্রহণ করলেন কেমন করে। উদ্দেশ্য, শিষ্যকে ভবসাগর হতে পার করে দেওয়া নয় উদ্দেশ্য, শিষ্যের অর্থ দ্বারা ইহলোকের অভাব সাগর পার হয়ে যাওয়া। দ্বিতীয় উপায় "গুরুর নিকট গায়ত্রী মন্ত্র গ্রহণ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করা।" নকল গুরু শুদ্ধ শিষ্যকে কিছুতেই গায়ত্রী মন্ত্র দিতে চান না। তৃতীয় উপায় "গুরুর নিকট যজ্ঞোপবীত গ্রহণের আবেদন করা।" নকল গুরুরা অধিকাংশই অত্রাঙ্গ শিষ্যকে যজ্ঞোপবীতের বিরোধী। তাঁরা নিজ হাতে কিছুতেই অত্রাঙ্গ শিষ্যকে যজ্ঞোপবীত দিবেন না। চতুর্থ উপায় "গুরুকে জিজ্ঞাসা করতে হবে তিনি বেদপাঠ করেছেন কিনা এবং বেদোক্ত বিধানে জীবন নিয়ন্ত্রিত করেন কি না।" নকল গুরুর চক্ষু এখানেও স্থির হয়ে যাবে। এই চারটি উপায় একে একে পরীক্ষা করে তবে গুরু গ্রহণ করতে হবে।

ব্যবসায়ী গুরুর আধিপত্যে দেশ ও সমাজ উচ্ছন্ন হতে বসেছে। দেশের অসংখ্য লোক ভগবানকে ভুলে, আত্মমর্যাদাকে ভুলে, জ্ঞান বিজ্ঞানকে ভুলে পার্থিব গুরু অর্চনায় মত্ত হয়েছে। যে শিষ্য জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই অন্যের চরণামৃত আকর্ষণ পান করতে শিখেছে, অন্যের পায়ে নিজের স্বাধীন চিন্তা ও বুদ্ধি স্বতন্ত্রকে বিসর্জন দিয়েছে, অন্যের নিকট নিজের মস্তককে বিক্রয় করেছে, তার দ্বারা জগতের কোন কার্য সাধিত হবে? সে, যে দাসবংশ সেই দাসবংশই। ইহা গুরুবাদ নয় মানবতার অপমান। বেদের আদেশ ভগবানই মুখ্য গুরু, গায়ত্রীই গুরুমন্ত্র এবং শান্ত, দান্ত, জিতেন্দ্রিয়, বিশ্বপ্রেমিক, বেদজ্ঞ, পক্ষপাত-রহিত, উদার রোগমুক্ত মহাপুরুষই গৌণ গুরু বা আচার্যরূপে বৃত হতে পারেন। সে গুরুর সম্ভ্রুতি তুলসী, চন্দন বা রৌপ্য মুদ্রার দ্বারা চলতে পারে না। তাঁকে সম্ভ্রুতি করতে হলে "তৎপ্রিয় কার্য সাধনম্" সেই পরমাত্মার প্রিয় কার্য দ্বারা সাধন করতে হবে।

কর্তব্য

আমাদের বাহিরের শরীর আহার্য-বস্তুতে গঠিত হয়। কিন্তু অন্তর্জগতে মনরূপী আর একটি বিরাট শরীর আছে। স্বাধ্যায়ই সেই মনরূপী শরীরের খাদ্য। মনের পরিচয়ই আমাদের মনুষ্যত্বের পরিচয়। মনটি যেরূপ হবে বাহিরের ত্রিয়াকলাপ এবং মানুষটিও ঠিক সেইরূপ হবে। যে যেরূপ গ্রন্থ পাঠ করবে, তার মনও সেইরূপই হবে। বাহিরের জলবায়ু আবহাওয়ায় প্রভাব যেরূপ প্রত্যক্ষভাবে আমাদের বাহিরের শরীরের উপর পড়ে, গ্রন্থের প্রভাবও ঠিক, তেমনি ভাবে আমাদের মনের উপর পড়ে। অশ্লীল, কুরূচিপূর্ণ ও তরল সাহিত্য পাঠে যেমন মন ও জীবন মলিন, কলুষিত ও কদর্য হয়ে যায়

গুরুগিরি

সংগ্রহ পাঠেও ঠিক তেমনই মন ও জীবন, সৎ ও সাধুভাবে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। অসংগ্রহ পাঠই আত্মহত্যা এবং সংগ্রহ পাঠই প্রতিষ্ঠা। স্বাধ্যায়ের অভাবে জীবন তরু দিন দিন শুষ্ক হয়ে যায়। এইজন্যই বৈদিক ধর্মে স্বাধ্যায়ের স্থান এত উচ্চে। মন, প্রাণ ও জীবনকে দিন দিন সরল ও পুষ্ট করে তুলতে হলে স্বাধ্যায়ই প্রধান অবলম্বন। আর্ষ ঋষিরা এই জন্যই স্বাধ্যায় বেদপাঠকে পঞ্চ মহাযজ্ঞের অঙ্গ বলে বর্ণনা করেছেন। বেদ অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনের মেরুদণ্ড এবং আর্ষসভ্যতার ভিত্তিশিলা। আর্ষজাতির আদর্শ, লক্ষ্য ও বৈশিষ্ট্য বেদমন্ত্রের আকারে আমাদের সম্মুখে রয়েছে। তাই, প্রতিদিন আর্ষ নরনারীকে সেই অমৃতময়ী বেদবাণী অধ্যয়নের জন্য আদেশ করা হয়েছে। এই বেদমন্ত্র যখন আর্ষ ভূমির নগরে, পল্লীতে, কাননে, কান্তারে, গৃহে ধ্বনিত হতো, তখন আর্ষ নরনারী, বাল বৃদ্ধা-যুবা আর্ষত্বের মহিমায় ভিতরে বাহিরে সমুজ্জ্বল ছিল, আর্ষত্বের গৌরবে সে জগতের মধ্যে মস্তক উন্নত করে চলত। যেদিন একদল স্বার্থপর জনসাধারণকে বেদপাঠের অধিকার হতে বঞ্চিত করল, বংশগত পাণ্ডিত্যের দোহাই দিয়ে দ্বিবেদী, ত্রিবেদী চতুর্বেদীরূপে মাতৃগর্ভ হতে ভূমিষ্ঠ হতে লাগল, সেইদিন হতেই বেদ প্রচারক ব্রাহ্মণ বেদ হতে দূরে পলায়ন করল, বেদও ব্রাহ্মণের নিকট অপরিচিত হতে লাগল। যাঁরা বেদের অধ্যাপনা করতেন ও সর্বসাধারণের নিকট বেদের প্রচার করতেন, তাঁদের নাম ছিল ব্রাহ্মণ। আর আজ পুরুষ পরম্পরায় অনেকে বেদ চর্মচক্ষুতেই দেখে নাই, কিন্তু নিরোট মুখ চাকুরীজীবী, পানিপাঁড়ে, দারোগায়ান, কুলি, হোটোলে বাবুচি ইত্যাদি যে কেউ আজ বশিষ্ঠ গোত্র, গৌতম গোত্র, ভরদ্বাজ গোত্রের দোহাই দিয়ে ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিতে দ্বিধা বা কুণ্ঠাবোধ করছে না। ব্রাহ্মণের ব্রত ছিল বেদের আদর্শ অন্য তিন বর্ণের নিকট প্রচার করা। ব্রাহ্মণের প্রচারের ফলেই ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র স্ব স্ব বর্ণগোষ্ঠিতে কার্য করত। ব্রাহ্মণের বেদ ভুলবার সঙ্গে সঙ্গে অন্য তিন বর্ণেরও অধ্যয়ন ঘটেছে। আজ ব্রাহ্মণ শূন্য রূপে বা পুরোহিতরূপে শিষ্যকে ও যজমানকে বিপ্র পাদোদকের মহিমা ও গুরুর চরণামৃতের মাহাত্ম্য প্রচার করছে এবং নানারূপ বার ব্রত পূজা-পার্বণ, তীর্থ, মূর্তি-পূজা প্রভৃতির ফন্দি এঁকে, নিরীহ অজ্ঞ নরনারীর অর্থ শোষণ করছে। ইহাই নাকি কলির ব্রাহ্মণের ঠিক স্বার্থত্যাগ।

স্তুতি ও প্রার্থনা, উপাসনার সঙ্গে সম্মিলিত মানুষের শক্তি সীমাবদ্ধ জগতের মধ্যে যিনি সৃষ্টির স্রষ্টা, নিয়মের নিয়ন্তা এবং শাসনের শাসক তাঁর শক্তি অসীম ও অনন্ত। এই শক্তিমানে সহিত নিজেকে মিলাতে পারলে, অনন্ত শক্তির প্রস্রবণের সহিত নিজেকে যুক্ত করতে পারলে আমরা শক্তিতে ভরপুর হয়ে উঠি। মানুষ কারোর শুভ গুণের চিন্তা করলে মহৎ এবং অশুভ গুণের চিন্তা করলে নীচ হয়। কোনও মানুষকে উপাস্যের স্থানে স্থাপিত করলে সেই উপাস্যের শুভ গুণের সহিত নানাবিধ দুর্গুণ উপাসকের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। পরমাত্মা থেকে অনেক শক্তিমান বা অধিক গুণবান আর কে আছে। উপাসনার অর্থ নিকটে অবস্থান করা। পরমাত্মার গুণাবলী চিন্তা করাই তাঁর নিকটে অবস্থান করা বা তাঁর উপাসনা। স্তুতির অর্থ গুণকীর্তন এবং প্রার্থনার অর্থ কোন কিছু প্রাপ্তির ইচ্ছার অভিব্যক্তি।

গুরুগিরি

কোনও স্ত্রীর পুরুষের পৌরুষ বা কোনো কবির কাব্য-কৌশল দেখলে তাঁর প্রশংসা বা গুণকীর্তন করা মানুষের পক্ষে যেমন স্বাভাবিক, অনন্ত শক্তি সামর্থ্য ও গুণের আধার পরমাত্মার স্বরূপ বর্ণনা বা প্রাপ্তির ইচ্ছা, মানুষের পক্ষে তেমনই স্বাভাবিক। এই উপাসনাই মানুষের অপূর্ণতাকে পূর্ণ করে দেয়, অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাকে তৃপ্ত করে দেয়। দুর্বল শিশু মাতৃকোড়ে বসে মাতার শক্তিতে শক্তিমান হয়ে যেমন জগতের যাবতীয় জীতি হতে অব্যাহতি পায়, ভক্তও তেমনই সেই জগজ্জননীর মধুর উপাসনায় জগতের যাবতীয় জীতি হতে ভয়হীন হয় এবং দিন দিন তার আত্মার ক্রমোন্নতি সাধিত হয়। আজ উপাসনাকেও মানুষ বিকৃত করে ফেলেছে। কেউ স্তব-স্তুতির দ্বারা পরমাত্মাকে খুশি করে পাপের ফল হতে নিষ্কৃতি পেতে চাচ্ছে। কেউ বাতাসা, ছাতু, আতপ তপ্তুল বা মহিষ পাঠায় রক্তে লোভ দেখিয়ে পরমাত্মার নিকট হতে ধন, রত্ন, পুত্র, ঐশ্বর্য লাভ করতে চাচ্ছে। কেউ বা পরমাত্মার আহার বাসস্থানের ব্যবস্থা করে নিজেদের উদর-পুরণের ব্যবস্থা করতেছে। লুণ্ঠন একইভাবে বেশীদিন চলে না। উপাসনা ও পূজার নামে নিত্য নূতন মূর্তিপূজা প্রবর্তন করে জনসাধারণকে সর্ববাস্তা করা হচ্ছে। উপাসনা প্রণালীর এই সব অধঃপতন দেখে জগতের বহু সরল আত্মাভোলা যুবক ঈশ্বরের অস্তিত্বেই সন্দিহান হচ্ছে ধর্মে বীতশ্রদ্ধ হচ্ছে এবং উপাসনায় ঘৃণা প্রকাশ করছে। আজ দেশে পুনরায় বৈদিক আদর্শে, প্রত্যহ প্রাতকালে এবং সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যা-উপাসনার প্রবর্তন করতে হবে। এইভাবে গৃহে গৃহে বালক বৃদ্ধ যুবা স্বাধ্যায় ও সন্ধ্যা-উপাসনায় ব্রহ্মযজ্ঞের অনুষ্ঠান করলে ভারতবর্ষ দেবভূমিতে পরিণত হবে।

বেদ গীতা শাস্ত্র আশ্রয়ণ

উপাসনার নামে কেউ কৃষ্ণ নাম জপ করতেছে, গৌরাঙ্গ নামে ক্রন্দন করতে করতে কেউ বা নকল গুরুমন্ত্র জপ করতেছে। মহর্ষি পতঞ্জলি বললেন- **"তস্য বাচক প্রণবঃ জপস্তদর্থ ভাবনন্"** [যোগদর্শন] **"সেই পরমাত্ম প্রণবমন্ত্র 'ওতম্' নামে খ্যাত এবং সেই প্রণবের অর্থ-ভাবনাকেই জপ বলে।"** আর্ষসন্তান পরমাত্মার অসংখ্য গুণ প্রকাশক এই **"ওতম্"** প্রাণ ভরে জপ করত এবং আধ্যাত্মিক চিন্তা দ্বারা নিজেকে মুক্তিপথের যাত্রী করত। স্বার্থপর কতকগুলো ভক্ত, অজ্ঞান ও মুর্থ জনসাধারণকে ওতম্ মন্ত্র হতে বঞ্চিত করে **'নমো নমঃ'** করাতে শেখালো। গুণের অর্থ পরমাত্মার স্বরূপ চিন্তন একথা লোকে ভুলে গেল। শিষ্যদের কানে কানে সঙ্গোপনে কালগায়ত্রী নামক অর্থহীন কতকগুলো উৎকট শব্দরাশি ঢুকিয়ে ব্যবসায়ী গুরুরা তাদের মস্তক কিনে নিল। বংশ পরম্পরায় আজও এসব গুরু, শিষ্য বংশের উপর একাধিপত্য করে আসতেছে। ইহাদের ব্যবসায়ের মূলধন কিছু চন্দন ও সংস্কৃত শ্লোক। ইহার দ্বারাই তাঁরা শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-নিধন সকলের অর্থ শোষণ করতেছে এবং শিষ্যেরাও নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করতেছে। আর একদল, অধম জনসাধারণের মুক্তির জন্য বিনামূল্যে নাম বিতরণ করতে এসেছে। তাঁদের মতে ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য, অক্ৰোধ — ধর্মের এই দশ লক্ষণ কলির জীবনের পক্ষে অনুপযোগী। তাঁরা বলেন কলিকালে আর কিছুই করতে হবে না। একবার শুধু **"হরি বোল"** **"হরি বোল"** বললেই

গুরুগিরি

যত বড় মহাপাপীই হোক না কেন, মৃত্যুর পর পুষ্পক রথে চড়ে বৈকুণ্ঠে যাবে। ইহারা তালে, মানে, গানে, বাদ্যযন্ত্রে, হাসতে, রোদনে, নামসঙ্কীৰ্তন করে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করেন। ইহারাই সর্বাপেক্ষা সুবিধাবাদী ও জগতের মহা অনিষ্টকারক। ইহারাই পুরাণের মধ্য নাম মহাত্মা প্রচারের জন্য নানারূপ উপাখ্যান সাজিয়েছেন। জনসাধারণ বুঝল অজামিল যখন সারাজীবন পাপকার্য করে মৃত্যুকালে তার পুত্র নারায়নকে ডাকতে গিয়ে উদ্ধার পেয়েছে, তখন আর ধর্ম ধর্ম করে এত কষ্ট করি কেন? সারাদিন পাপ করে সন্ধ্যাবেলা কিছু নাম সঙ্কীৰ্তন করে নিলেই পাপ তাপ ধুয়ে যাবে। কেউ মনে করলেন গুরু যখন কানের ভিতর মন্ত্র ঢুকিয়ে দিয়েছেন, তখন শরীর পবিত্র হয়ে গিয়াছে। এখন সারাজীবন পাপ করলেও গুরুমন্ত্র সকলই হজম করতে পারবে। এই শ্রেণীর ভক্তেরা নাম সঙ্কীৰ্তন ও গুরুমন্ত্রকে হজমাগুলি মনে করেন। আমাদের দেশে নাম জপ করবার খলি আছে। তিব্বতে বৌদ্ধদের জন্য চাক্রির উপর মন্ত্র খোদাই করা আছে। স্ত্রীং-এ দম কষে ছেড়ে দিলে চাক্রি ঘুরতে থাকে। ভক্তেরা মন্ত্রের চাক্রিতে দম দিয়ে বাহিরে চলে গেলেও গৃহে চাক্রি যতবার ঘুরতে থাকবে, তাঁর ততবার মন্ত্র জপ করা হবে। সাধনার এতই সহজ কৌশল আবিষ্কৃত হয়েছে। আমাদের দেশেও একজনের একজনের বাবার আন্ধের জন্য অন্যজন এসে গীতা ও বিরাট পাঠ করে, একজনের পূজা অর্চনা অন্য একজন মাংশুল (দক্ষিণা) নিয়ে শেষ করে। ব্রহ্মযজ্ঞের স্বাধ্যায় ও উপাসনা ভুলে লোক আজ এইভাবে অন্ধকারে ছুটাছুটি করছে।

বেদ গীতা শাস্ত্র আন্বেষণ

॥ ৩৩ম ॥

॥ আর্থ সমাজের দশ নিয়ম ॥

- সব সত্য বিদ্যা এবং যা পদার্থ বিদ্যা দ্বারা জানা যায় সে সকলের আদিমূল পরমেশ্বর।
- ঈশ্বর সচ্চিদানন্দস্বরূপ, নিরাকার, সর্বশক্তিমান, ন্যায়কারী, দয়ালু, অজন্মা, অনন্ত, নির্বিকার, অনাদি, অনুপম, সর্বাধার, সর্বেশ্বর, সর্বব্যাপক, সর্বান্তর্যামী, অজর, অমর, অভয়, নিত্য, পবিত্র ও সৃষ্টিকর্তা, তাঁরই উপাসনা করা উচিত।
- বেদ সব সত্যবিদ্যার পুস্তক, বেদের পঠন-পাঠন, শ্রবণ ও শ্রাবণ সব আর্থের পরম ধর্ম।
- সত্য গ্রহণে ও অসত্য পরিত্যাগে সদা উদ্যত থাকবে।
- সব কাজ ধর্মানুসারে অর্থাৎ সত্য ও অসত্য বিচারপূর্বক করা উচিত।
- সংসারের উপকার করা এই সমাজের মুখ্য উদ্দেশ্য অর্থাৎ শারীরিক, আত্মিক ও সামাজিক উন্নতি করা।
- সকলের সঙ্গে প্রীতিপূর্বক ধর্মানুসার যথাযোগ্য ব্যবহার করা উচিত।
- অবিদ্যার নাশ ও বিদ্যার বৃদ্ধি করা উচিত।
- প্রত্যেককে নিজের উন্নতিতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত নয়, কিন্তু সকলের উন্নতিতে নিজের উন্নতি ভাবা উচিত।
- সব মনুষ্যকে সামাজিক সর্বহিতকারী নিয়ম পালনে পরতন্ত্র এবং প্রত্যেক হিতকারী নিয়মে সবাইকে স্বতন্ত্র থাকা উচিত।